



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 177 - 184

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর

ড. অনুপ কুমার মাজি

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

Email ID : 214anup@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Subaltern Voice,
Social Realism,
Humanitarianism,
Class Struggle,
Authenticity,
Existential Crisis,
Psychological
Depth.

Abstract

Samaresh Basu (also known as 'Kalakut') is a unique figure in Bengali prose, who brought a new dimension to the lives of the marginalized and subaltern classes. His literature was a raw and unfiltered document of the lives, struggles, and psychology of the working class, breaking away from the so-called 'bhadralok' (gentlemanly) literary tradition. His personal experiences—working in the Ichhapur factory and living with the fisherfolk—gave his writing a profound authenticity and sensitivity.

In his timeless novel 'Ganga', he depicts the lives of the fishing community against the backdrop of nature's harshness. Characters like Tentele Bilas and Himi aren't just victims of poverty; they are indomitable fighters. Similarly, in works like 'Uttaranga' and 'Shrimati Cafe', he highlights the lives of factory workers, their relationship with machines, and the psychological aspects of class struggle. Samaresh Basu didn't view sexuality merely as a physical desire; he portrayed it as a reflection of the subaltern class's existential crisis and desperation. His controversial novels 'Bibor' and 'Prajapati' challenge the moral hypocrisy of middle-class society.

However, the most significant aspect of his literature is his humanism. In stories like 'Adab', he shows how, even amidst communal riots, people from the lower class establish a shining example of humanity through their class solidarity and empathy. Samaresh Basu not only depicted the lives of the subaltern but also permanently established their unique language, culture, and voice in literature. His works are an immortal testament to the true lives and struggles of the subaltern.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) এক স্বতন্ত্র ও বিপ্লবী প্রতিভার নাম। যে সাহিত্য একসময় প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ এবং পারিবারিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত, সেই বৃত্ত ভেঙে সমরেশ বসু প্রবেশ করেছিলেন সমাজের একেবারে প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের জীবনে। তিনি তথাকথিত 'ভদ্রলোকি' সাহিত্যের সুসজ্জিত ভ্রমিৎরুমে ছেড়ে নেমে এসেছিলেন কারখানার নোংরা মেঝেতে, গঙ্গার ভাঙন-কূলের কাদামাটিতে, এবং

শ্রমজীবী মানুষের ঘামে ভেজা বস্তির অন্ধকার গলিতে। তাঁর সাহিত্যকর্ম ছিল নিছক কোনো জীবনচিত্র নয়, বরং নিম্নবর্ণের কণ্ঠস্বরের এক অপ্রতিরোধ্য বিস্ফোরণ।

তাঁর লেখনীতে সমাজের সেইসব মানুষ কথা বলতে শুরু করল, যাদের ভাষা এতদিন সাহিত্যে ছিল ব্রাত্য। তারা ছিল দিনমজুর, জেলে, কারখানার শ্রমিক, বস্তির বাসিন্দা— যাদের জীবন ছিল প্রতিদিনের অস্তিত্ব রক্ষার এক কঠিন লড়াই। সমরেশ বসু এদের শুধু দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেননি, তিনি তাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তাঁর নিজেরই কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম তাঁর লেখায় এনেছিল এক অনবদ্য সত্যনিষ্ঠা ও গভীর সংবেদনশীলতা। এই ব্যক্তিগত সংযোগই তাঁর সাহিত্যকে কোনো করুণার সাহিত্য হতে দেয়নি, বরং তাকে পরিণত করেছে নিম্নবর্ণের জীবন ও সংগ্রামের এক প্রামাণ্য দলিলে। এই প্রবন্ধে আমরা সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্ণের এই অবিস্মরণীয় কণ্ঠস্বরের প্রকাশ, তার শিল্পরূপ এবং সমাজের উপর তার গভীর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সমরেশ বসুর সাহিত্যকর্মকে বুঝতে হলে তার জীবনকে বুঝতে হবে। সাহিত্য তাঁর কাছে নিছক কল্পনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন ছিল না, বরং ছিল জীবনের এক জ্বলন্ত বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। তাঁর লেখার মূল শক্তিই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা— যা ছিল সমাজের নিম্নবর্ণের জীবনের সঙ্গে সরাসরি মিশে থাকার ফল।

সমরেশ বসুর শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি জীবনযুদ্ধে নেমে পড়েন। ইছাপুরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করা, মজুরের জীবনযাপন, দিন-রাত ঘামের গন্ধ আর যন্ত্রের কর্কশ শব্দ শোনা— এইসব অভিজ্ঞতা তাঁর চেতনার গভীরে প্রোথিত হয়েছিল। তিনি কেবল কারখানার একজন শ্রমিক ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই সমাজের এক সংবেদনশীল পর্যবেক্ষক। তিনি জানতেন, একজন শ্রমিক দিনের শেষে কী ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফেরে, তার পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে তাকে কী নিরন্তর লড়াই করতে হয়।

এই অভিজ্ঞতার কারণেই তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিতে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যখন কল-কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে লিখতেন, তখন তা ছিল না কোনো বাইরের মানুষের বিবরণ। তিনি তাদের ভাষা, তাদের রাগ-অভিমান, তাদের প্রেম-ভালোবাসা এবং তাদের শ্রেণিগত ঘৃণা— সবকিছুই জানতেন অন্তর থেকে। ‘বি.টি. রোডের ধারে’, ‘উত্তরঙ্গ’ বা ‘শ্রীমতি ক্যাফে’-এর মতো রচনাগুলোতে শ্রমিকের জীবনের যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উঠে এসেছে, তা কেবল একজন বহিরাগতের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। একজন শ্রমিককে তার সহকর্মী কেন সহ্য করতে পারে না, ট্রেড ইউনিয়ন কেন তার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন, বা সামান্য মাইনে বৃদ্ধি কেন তার কাছে বিশাল প্রাপ্তি— এইসব বোধ তাঁর লেখায় গভীর বাস্তবতা এনে দিয়েছে।

একইভাবে, ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র। সমরেশ বসু নিজে জেলে ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে মিশেছেন। তাদের নৌকায় উঠেছেন, তাদের ভাষা শুনেছেন, নদীর প্রতি তাদের ভয় ও ভালোবাসাকে অনুভব করেছেন –

“মা গঙ্গার নির্দয় হওয়া যে কী বস্তু, সে জানে তারা, যাদের জীবন মরণ গঙ্গার গহ্বরে।”^১

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিলাসের মতো একজন জেলের কাছে গঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, সে এক জীবন্ত সত্তা— যে কখনও তাদের অন্ন জোগায়, আবার কখনও তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব, জীবনের আদিম রূঢ়তা এবং অস্তিত্বের জন্য নিরন্তর সংগ্রামকে তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সেই সকল অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই উপন্যাসে তিনি বলতে পেরেছেন –

“মাছমারার মাছ পেলে জ্বালা, না পেলেও জ্বালা। দেখা যায় যেন এইটিও তার জীবনেরই বিধান।”^২

এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সমরেশ বসুকে মধ্যবিত্ত সমাজের তথাকথিত নৈতিকতা ও শুচিবায়ুতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তিনি জানতেন, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে নৈতিকতা এক বিলাসিতা। তাই ‘বিবর’ বা ‘প্রজাপতি’-র মতো উপন্যাসে তিনি যখন যৌনতাকে জীবনের এক রুক্ষ বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরেছেন, তখন তা ছিল তাঁর বাস্তববোধেরই প্রতিফলন। তিনি দেখিয়েছেন, দারিদ্র্য, হতাশা এবং জীবনের একঘেয়েমি মানুষের নৈতিক কাঠামোকে কীভাবে ভেঙে দেয়।

সমরেশ বসু শুধু গ্রামীণ মৎস্যজীবী বা নদী-তীরের জীবনই আঁকেননি, বরং তাঁর লেখনীর এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-শ্রেণির জীবন। তিনি এই জগতের একজন ছিলেন। তাই তাঁর লেখায় কারখানার ভেতরের বাতাস, যন্ত্রের শব্দ আর শ্রমিকদের ঘামের গন্ধ— সবকিছুই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১) ছিল এই শ্রেণির জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। এই উপন্যাসে তিনি জগদল-সেনপাড়া অঞ্চলের তাঁতিদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং শ্রেণি-চেতনার উত্থানকে নিবিড়ভাবে চিত্রিত করেছেন। ইংরেজদের শিল্প প্রসারের কারণে দেশি শিল্পের সংকট এই উপন্যাসের বিষয়। দেশি শিল্পীরা নিজেদের শিল্প হারিয়ে চরম অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়। এদের অনেকে কলকারখানায় যেতে বাধ্য হলেও কানুর মতন শিল্পীরা এটা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। আর সে কারণেই তাঁত ঘরের মাচার বাঁশে কানুর আত্মহত্যা। ইংরেজ অনুগ্রহে কিছু অনুদানের আশ্বাস কানুর বৌকে দেওয়া হয়। কানুর বৌ এই অনুদান নিতে অস্বীকার করে জানায় –

“...তার দরকার নেই। সেজবাবুকে বল আমারজবানি দে আর একখানা চিঠি লিখে দিতে যে, গায়ের জোরে যারা সব নিল তাদের কাছে দয়া মেগে কি কিছু পাওয়া যাবে?”^৩

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় বাঁচার আশা নিয়ে কারখানায় গিয়েও পবন চাঁড়াল শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। আত্মহত্যা করে সে। কানু ভড়, গনি মিঞা তো আগেই মারা গেছে। সিপাহী হীরালালের আত্মবিশ্বাস আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই লেখাগুলো নিছক শ্রমিকের কাজ ও কষ্টের বিবরণ নয়; এটি যন্ত্রের গোলকধাঁধায় আটকে পড়া মানুষের মনস্তত্ত্বের এক গভীর বিশ্লেষণ।

সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, কারখানার জীবন শ্রমিকদের কাছে এক দ্বৈত সত্তা নিয়ে আসে। একদিকে যন্ত্র তাদের রুটি-রুজির উৎস, অন্যদিকে তা তাদের জীবনের একঘেয়েমির কারণ। একই কাজ দিনের পর দিন করতে করতে তাদের জীবন যান্ত্রিক হয়ে যায়, সৃজনশীলতা হারিয়ে যায়। তিনি এই যান্ত্রিকতার ফলে সৃষ্ট মানসিক ক্লান্তি, হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরেছেন। শ্রমিকরা যেন যন্ত্রের সঙ্গে এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা, যেখানে তাদের ব্যক্তিসত্তা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।

শ্রেণি-চেতনা ও সংহতির উন্মেষ: শ্রমিকদের জীবনে শ্রেণি-চেতনা এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। সমরেশ বসু দেখান, শ্রমিকরা যখন নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে লড়ে, তখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে তাদের প্রত্যেকের সমস্যা এক, তখন জন্ম নেয় এক প্রবল সংহতি। ট্রেড ইউনিয়ন এই সংহতিরই প্রতীক। ‘উত্তরঙ্গ’ উপন্যাসে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ধর্মঘট এবং শ্রেণি-সংগ্রামের চিত্র এসেছে। তবে তিনি এই আন্দোলনকে কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি, দেখেছেন এর মানবিক দিক। ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের পেটে ক্ষুধা, তাদের পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এবং একইসঙ্গে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করার অদম্য সাহস— এইসব বিষয়কে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সমরেশ বসুর লেখায় শ্রমিক-শ্রেণির সংগ্রাম শুধু মালিকের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের ভেতরের লোভ, অবিশ্বাস এবং ঈর্ষার বিরুদ্ধেও। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে এক শ্রমিক অন্য শ্রমিকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়, কীভাবে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। আবার, কীভাবে এই বিভেদকে কাটিয়ে তারা নিজেদের অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর লেখাকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলে। ‘শ্রীমতি ক্যাফে’-এর মতো গল্পগুলোতে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের আড্ডা, তাদের আক্ষেপ এবং সমাজের প্রতি তাদের ক্ষোভের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলো শুধু কাজ করে না, তারা স্বপ্ন দেখে, মদ খায়, ঝগড়া করে এবং ভালোবাসে— তাদের জীবনও মধ্যবিত্তের জীবনের মতোই জটিল ও বহুমুখী।

সমরেশ বসু শ্রমিকদের নিজস্ব ভাষারীতি, তাদের গালিগালাজ, তাদের আড্ডার ধরন এবং তাদের সংস্কৃতিকে নিপুণভাবে তাঁর লেখায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ভাষা তাদের জীবনের রূঢ়তাকে, তাদের হতাশা এবং প্রতিবাদকে প্রকাশ করে। এটি শুধুমাত্র একটি ভাষাগত কৌশল নয়, বরং শ্রমিক-শ্রেণির নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে সম্মান জানানোর একটি প্রয়াস। সমরেশ বসু তাই বাংলা সাহিত্যে শ্রমিক-শ্রেণির জীবনকে এক নতুন সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি তাদের নিছক শ্রমের যন্ত্র

হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে— যাদের রয়েছে স্বপ্ন, ভালোবাসা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল জেদ। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে শ্রমিক-শ্রেণির জীবন ও শ্রেণি-সংগ্রাম বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতে এক স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত দিক হ যৌনতার বাস্তবসম্মত উপস্থাপন। বাংলা সাহিত্যের এক রক্ষণশীল সময়ে তিনি যখন যৌনতাকে তার নগ্ন রূপে, সমাজের রূঢ় বাস্তবতার অংশ হিসেবে তুলে ধরেন, তখন তা কেবল সাহিত্যিক পরীক্ষা ছিল না, ছিল এক সামাজিক ও নৈতিক বিদ্রোহ। তিনি যৌনতাকে শুধু কামনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি, বরং তাকে দেখেছেন নিম্নবর্ণের জীবন, তাদের দারিদ্র্য, হতাশা এবং অস্তিত্বের সংকটের এক অপরিহার্য প্রতিচ্ছবি হিসেবে। তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস ‘বিবর’ (১৯৭৪) এবং ‘প্রজাপতি’ (১৯৬৭) এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

যৌনতা নয়, অস্তিত্বের সংকট: সমরেশ বসুর সাহিত্যে যৌনতা নিছক শারীরিক তৃষ্ণা বা রোমান্টিক সম্পর্ক নয়। এটি নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে একধরনের পালানোর পথ, জীবনযুদ্ধের এক কঠিন হাতিয়ার, অথবা হতাশার এক অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ। ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখেন, যে একঘেয়ে, দারিদ্র্যপীড়িত জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। তার জীবনে যৌনতা কোনো বিলাস নয়, বরং এক মানসিক শূন্যতা পূরণের মরিয়া চেষ্টা। সে যখন একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তা কেবল যৌনতার জন্য নয়, বরং জীবনের প্রতি তার হতাশা, একাকিত্ব এবং ভালোবাসার এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার ফল। সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, যখন মানুষের জীবন থেকে স্বপ্ন ও আশা হারিয়ে যায়, তখন জৈবিক প্রবৃত্তিগুলোই তার অস্তিত্বের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

নৈতিকতার দ্বিচারিতার এই ক্ষেত্রটিতে সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত সমাজের তথাকথিত ‘ভদ্রলোকি’ নৈতিকতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যে সমাজে যৌনতার প্রকাশকে অশ্লীল বলে গণ্য করা হয়, সেই সমাজের ভেতরেই চলে ভগ্নমি ও নৈতিকতার দ্বিচারিতা। সমরেশ বসু দেখান, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিকতা আর নিম্নবিত্তের নৈতিকতা এক নয়। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে নৈতিকতার সংজ্ঞা ভিন্ন। যখন জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলোই পূরণ হয় না, তখন যৌনতা সংক্রান্ত প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন খাবারের জন্য যেকোনো কাজ করতে পারে, তেমনি অস্তিত্বের সংকট বা মানসিক হতাশা মানুষকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করে, যা তথাকথিত সমাজের চোখে ‘অনৈতিক’। সমরেশ বসু এই নিষ্ঠুর সত্যকে সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তাঁর লেখায় যৌনতা শুধু পুরুষের দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নারীর দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর নারী চরিত্ররা প্রায়শই তাদের শরীরকে জীবনের এক কঠিন সংগ্রামে ব্যবহার করে। তারা যৌনতাকে কখনো জীবনধারণের উপায় হিসেবে বেছে নেয়, আবার কখনো এটি তাদের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। ‘বিবর’ উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থা নারীর শরীরকে পণ্য করে তোলে। কিন্তু এই নারী চরিত্ররা কেবল ভিকটিম নয়, তারা একইসঙ্গে সংগ্রামী। তারা তাদের পরিস্থিতি বোঝে এবং জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্ণের সমাজে যৌনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ কীভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমরেশ বসুর কাছে যৌনতার উপস্থাপন ছিল এক ধরনের সামাজিক বিদ্রোহ। তিনি প্রচলিত সাহিত্যের ছক ভেঙেছেন, যেখানে যৌনতাকে স্রেফ রোমান্স বা প্রেম হিসেবে দেখানো হতো। তিনি এটিকে সমাজের এক রূক্ষ বাস্তবতার প্রকাশ হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা একসময় অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকরা বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি যা লিখেছেন তা নিছক যৌনতা নয়, বরং সমাজের এক উপেক্ষিত অংশের জীবন ও মনস্তত্ত্বের এক নিরাবরণ দলিল। তিনি যৌনতাকে ব্যবহার করেছেন সমাজের শোষণ, দারিদ্র্য এবং মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরার জন্য।

সমরেশ বসুর সাহিত্যে তাই যৌনতার মাধ্যমে সমাজের গভীর ক্ষত এবং শ্রেণি-পার্থক্যের দ্বন্দ্বিকতাকে তুলে ধরেছে। তিনি দেখিয়েছেন, নৈতিকতা এক আপেক্ষিক ধারণা, যা মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর

নির্ভরশীল। তাঁর এই বিশ্লেষণ বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনকে এক নতুন সংজ্ঞায় চিত্রিত করেছে।

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যের এক অন্যতম উজ্জ্বল দিক হল তার গভীর মানবিকতা। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনকে শুধু তার রুঢ় বাস্তবতায় দেখাননি, বরং সেই রুঢ়তার মধ্যেও যে মানবিক সংবেদনশীলতা, প্রেম, এবং সহমর্মিতার স্পন্দন লুকিয়ে থাকে, তাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য প্রমাণ করে যে, দারিদ্র্য বা শ্রেণিভেদ মানুষের ভেতরের মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না।

মার্কসবাদী ভাবনায় প্রভাবিত হলেও সমরেশ বসুর লেখায় শুধুমাত্র মতাদর্শগত প্রচারণা নয়, বরং মানবিক উপলব্ধি অধিক প্রধান। তাঁর চোখে নিম্নবর্ণের জীবন কোনো করুণার বিষয় নয়, বরং আত্মমর্যাদা ও সংগ্রামের স্থান। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে আলাদা করে। ‘প্রতিরোধ’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’, ‘গঙ্গা’, ‘নয়নপুরের মাটি’ প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন, তেমনি অসংখ্য ছোটগল্পেও সমরেশ নিম্নবর্ণের মানুষের রক্ত-মাংসের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

সমরেশ বসুর বিখ্যাত ছোটগল্প ‘আদাব’ এই প্রসঙ্গে এক অসাধারণ উদাহরণ। বাংলার দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে দুজন নামহীন শ্রমজীবী— একজন হিন্দু, একজন মুসলিম— সংঘাতের সময় একসঙ্গে আশ্রয় খুঁজে নেয়। নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় থেকে মুক্ত হয়ে তারা দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং সংগ্রামের অভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে এক অভিন্ন মানবতাকে খুঁজে পায়। তাদের অভিন্ন কষ্ট ধর্মীয় বিভেদকে অতিক্রম করে যায়, যা সহানুভূতির এক গভীর বন্ধন তৈরি করে। তাদের মধ্যে বিনিময় হওয়া শেষ শব্দটি, ‘আদাব’, ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিবাদের কাজ করে, যা মানবসৃষ্ট বিভাজনের উর্ধ্বে মানব যোগাযোগের স্থায়ী শক্তির এক প্রমাণ।

গল্পে চরিত্র দুটির কোনো পরিচয় নেই, তাদের শুধু কাজ আর শ্রমের মাধ্যমে চেনা যায়। তারা একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান। কিন্তু যখন তারা দাঙ্গার রাতে এক রাস্তার পাশে ম্যানহোলে আশ্রয় নেয়, তখন তাদের ধর্ম পরিচয় গোঁণ হয়ে যায়। তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে, নিজেদের জীবনের কথা বলে— কতটা পরিশ্রম করে তারা বেঁচে থাকে, তাদের স্বপ্নগুলো কী, এবং কীভাবে তারা প্রতিদিনের লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়। তারা বুঝতে পারে যে, তাদের ভাষা, তাদের ক্ষুধা, তাদের কষ্ট এবং তাদের জীবনযাত্রা একই সূত্রে গাঁথা। এই বোঝাপড়া তাদের মধ্যে এক গভীর মানবিক বন্ধন তৈরি করে।

এই গল্পে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন যে, শ্রেণিগত ঐক্য কীভাবে ধর্মীয় বিভেদকে ছাপিয়ে যেতে পারে। দাঙ্গার মূল কারণ যেখানে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, সেখানে এই দুই শ্রমজীবী মানুষ সেইসব স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে। গল্পটির শেষে যখন দাঙ্গাবাজরা তাদের ঘিরে ধরে, তখনও তাদের শেষ শব্দটি হয় ‘আদাব’ —যা তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মানবিক বন্ধনের প্রতীক। এটি ছিল এক নীরব বিদ্রোহ— ঘৃণার বিরুদ্ধে ভালোবাসার, বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্যের।

শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঘাম, রক্তের সঠিক মূল্য মালিক শ্রেণি যে কোনদিন দেয় না – এটা কমবেশি আমাদের জানা বলে আমরা অবাক হই না। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিকের হাত কেটে গেলে কাটা হাতের সেই মাংসকে পশুর চর্বি ও গড়িয়ে পড়া রক্তকে রং বলে ম্যানেজারের কাছে বিবৃতি দেওয়া হলে আমাদের অবাক হতে হয় বইকি! ‘রং’ গল্পে এই সকল পৈশাচিক মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখক।

সমরেশ বসুর সাহিত্যে নিম্নবর্ণের কণ্ঠস্বর শুধু শোষণ ও দারিদ্র্যের কাহিনি নয়, বরং প্রতিরোধ, পরিচিতির সন্ধান, এবং মানবিক মর্যাদার জন্য লড়াইয়ের এক জীবন্ত দলিল। তাঁর চরিত্রগুলি সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকলেও তাদের অস্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ কখনো সন্মিলিত আন্দোলনের রূপ নেয়, কখনো ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সমরেশ বসু তাঁর চরিত্রগুলির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে নিম্নবর্ণের মানুষ শুধু শোষণের শিকার নয়, বরং তাদের মধ্যে একটি অদম্য চেতনা ও পরিচিতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাঁর সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলিও এই প্রতিরোধ ও পরিচিতির সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শ্রেণি ও লিঙ্গের দ্বৈত শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে আরও জটিল ও গভীর করে।

‘ষষ্ঠ ঋতু’ গল্পে আমরা গগন নামে অসামান্য একটি চরিত্রকে পাই। গল্পে বারান্দা কৃষকভূমিনীর অনুগ্রহে আশ্রিত খোলুধি হিসেবেই তার পরিচয়। গগন শ্রমজীবী চরিত্রের উজ্জ্বল এক চরিত্র যার সুন্দর একটি মন রয়েছে। সুন্দর চিন্তার অধিকারী সে। বারান্দা কৃষকভূমিনীর যৌবন গত হলে কোন এক বাবুর আশ্রিত হয়ে শেষ জীবনটা থাকতে চেয়েছিল। পরের আশ্রয়ে থাকাকেই যেখানে ভবিতব্য ধরে নিয়েছিল সেখানে গগন নিজে শ্রম দিয়ে উপার্জন করে তাকে সম্মানের সঙ্গে রাখতে চাওয়ার পরিবর্তে বিনীত ভাবে নিজে থাকার মিনতি করেছে। সে বলেছে - “তা আমাকে যদি বল এখনও রিকশাটা চালাই, রোজগার হয়, আমি তোমার কাছে থাকতে পারি” আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় কৃষকভূমিনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

‘লড়াই’ গল্পে যে অন্ত্যজ জেলে সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই জীবনে রয়েছে নিরন্তর অভাব। রয়েছে সামাজিক ঘাত প্রতিঘাত। পেটের ক্ষুধা মেটানোর লড়াইয়ে সমুদ্র যাত্রার এই বর্ণনাতে পাই -

“ওরা আসছে। এখন তাঁটা, সমুদ্রে যাচ্ছে। যাচ্ছে গন্ধ বয়ে নিয়ে। আর ওরা আসছে। উজান ঠেলে, নিঃশব্দে, দল বেঁধে, গায়ে গা দিয়ে আসছে। আর বদি যাচ্ছে মুখোমুখি হতে। জীবনের সঙ্গে আর মনের সঙ্গে এই রকম আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হয় বাবা বদি।”^৪

পেটের ক্ষুধা মেটানোর নিত্যদিনের এই লড়াই জেলে সম্প্রদায়ের যেন ভবিতব্য। এই জেলে শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশার করুণ জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে বলেছিলেন -

“ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।”^৫

সমরেশ বসুর সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষের দুর্দশার করুণ জীবনের বর্ণনা যেমন রয়েছে তেমনি সমবেত দুঃখী মানুষদের একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃশ্যও দুর্লভ নয়। এই ধরনের ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে তার বিশেষ যত্নের দিকটি চোখ এড়ায় না। যেমন - ‘প্রতিরোধ’ গল্পে তিনটি চরিত্র—সুবল, সাধু ও মনাই। অর্থলোভী মজুতদারদের উৎখাত করে কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে কৃষকদের নেতৃত্বে কৃষকদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে এরই কাহিনি গল্পে বর্ণিত হয়েছে। শয়ে শয়ে কৃষক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। কাপড়ের অভাবে মেয়েরা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে। এমনি দুর্বিষহ জীবনের বর্ণনা সুবলের গানে প্রকাশ পায়—

“রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে

আড়তদার রঘু সাউ গুদামে বইয়া চাউলের পোকা ঝাড়ে

ও ভাই চালের বস্তায় পচানি ধরেছে।

সোনা মিয়ার আড়তে ভাই বস্তা নাহি ধরে,

ও ভাই— কলিরাজা মরণ বাড় বেড়েছে।”^৬

সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে মুনাফাখোর, অর্থলোভী মজুতদারের বিরুদ্ধে সকল কৃষক একত্রিত হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। শেষ পর্যন্ত নারী-পুরুষ সবাই মিলে প্রতিরোধ গড়ে পাকা ফসল রক্ষা করে কৃষকের ন্যায্য পাওনা তারা আদায় করে নেয়। এভাবেই সমরেশ বসুর সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তিনি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসে তাদের কণ্ঠস্বরকে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য কেবল গল্প বা উপন্যাস নয়, বরং একটি সমাজতাত্ত্বিক দলিল, যা শ্রেণিসংগ্রাম, শোষণ, এবং মানুষের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কথা বলে। তাঁর লেখায় সমাজের কঠিন বাস্তবতা এবং মানুষের জীবনীশক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে, যা পাঠককে হতাশার পরিবর্তে প্রতিরোধের প্রেরণা দেয়। লেখকের নিজের কথায় -

“আমি শ্রমিক বা সমাজের নিচুতলার মানুষ বা মধ্যবিত্ত যাদের কথাই লিখেছি, তারা কেউ বিমূর্ত মানুষ না, প্রেম, ক্ষুধা, লড়াই, সুস্থতা, বিকার সবকিছু নিয়ে যে মানুষ তারাই আমার অস্থি। এখনও আমি সেই অশ্বেষণেই নিরন্তর।”^৭

সমরেশ বসু তাঁর লেখায় বারবার দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গের জীবনে প্রেম বা ভালোবাসা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি তাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অঙ্গ। ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের বিলাস বা হিমির মতো চরিত্ররা জীবনের কঠিন সংগ্রামে জড়িয়ে থেকো

ভালোবাসার জন্য লড়াই করে। তাদের ভালোবাসা তথাকথিত সমাজের প্রেম-ভালোবাসার মতো রোমান্টিক নয়, এটি আরও বেশি বাস্তব ও মাটির কাছাকাছি। বিলাসের হিমির প্রতি টান তার জীবনের এক শক্তি, যা তাকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার সাহস জোগায়।

সমরেশ বসুর চরিত্রেরা শুধু নিজেদের জন্য ভাবে না। তারা জানে, তাদের মতো আরও অনেকেই জীবনের একই রকম কঠিন লড়াইয়ে আছে। তাই তাদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সহমর্মিতা দেখা যায়। একজন শ্রমিকের দুঃখ অন্য একজন বুঝতে পারে। তারা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়, সাহায্য করে এবং একে অপরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই সংবেদনশীলতা তাদের সংগ্রামী জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা তাদের টিকে থাকার শক্তি জোগায়।

সমরেশ বসু প্রমাণ করেছেন যে, মানবিকতা কোনো বিশেষ শ্রেণির সম্পত্তি নয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষের মধ্যেও তা সমানভাবে উজ্জ্বল। তিনি তাদের জীবনকে শুধু তাদের দারিদ্র্য দিয়ে বিচার করেননি, বরং তাদের ভেতরের সেই মানবিক আলোটুকুও ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কঠিনতম পরিস্থিতিতেও জ্বলে থাকে। তাঁর সাহিত্য তাই নিম্নবর্গের মানুষের সংগ্রামী জীবনের পাশাপাশি তাদের গভীর মানবিকতারও এক শক্তিশালী দলিল।

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তিনি কেবল একজন গল্পকার বা উপন্যাসিক ছিলেন না, ছিলেন এক নির্ভীক সমাজ-চিত্রকর, যিনি তাঁর কলমের তুলিতে সমাজের সেইসব অবহেলিত মানুষের জীবনকে আঁকেছেন, যাদের অস্তিত্ব এতদিন ছিল উপেক্ষিত। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর কেবল শোনা যায় না, বরং তা জীবনের উষ্ণ নিশ্বাস নিয়ে পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তাঁর সাহিত্য ছিল এক শক্তিশালী দলিল, যা মধ্যবিত্ত সমাজের ‘ভদ্রলোকি’ নৈতিকতা ও শুচিবায়ুতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, জীবনের রুঢ় বাস্তবতা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের কাছে নৈতিকতার সংজ্ঞা ভিন্ন। তাঁর চরিত্রেরা— গঙ্গার তীরের বিলাস থেকে কারখানার শ্রমিক সুখের পর্যন্ত— কেউই আদর্শ চরিত্র নয়। তারা ভুল করে, তারা হতাশ হয়, তারা তাদের জৈবিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু এখানেই তাদের মহত্ত্ব। তারা নিজেদের দোষ-গুণ, হতাশা-স্বপ্ন, আর সংবেদনশীলতা নিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা রক্ত-মাংসের মানুষ, যারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে।

সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, দারিদ্র্য আর বঞ্চনা মানুষের অন্তরাত্মাকে কেড়ে নিতে পারে না। বরং, সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই মানবিকতা, সংহতি এবং ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাঁর সাহিত্য শুধু শ্রেণি-সংগ্রামের কাহিনি নয়, এটি জীবনের সেই মৌলিক গান, যা ক্ষুধা, ঘাম আর রক্তে লেখা। তাঁর ‘আদাব’ গল্পের মতো, তাঁর সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমস্ত বিভেদের উর্ধ্বে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

পরিশেষে বলা যায়, সমরেশ বসুর সাহিত্য ছিল তাঁর জীবনের এক নির্যাস। তিনি যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, তাকেই কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণেই তাঁর সৃষ্ট নিম্নবর্গের চরিত্রগুলো নিছক সাহিত্যিক কল্পনা নয়, তারা আমাদেরই চেনা জগতের রক্ত-মাংসের মানুষ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর সাহিত্যের বুনন-সূতো, যা দিয়ে তিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের এক জীবন্ত চিত্রপট তৈরি করেছিলেন। তাঁর রচনা প্রমাণ করে, সাহিত্য তখনই মহৎ হয়, যখন তা জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যায় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধারণ করে। তাঁর সাহিত্য তাই কেবল সাহিত্য নয়, এটি তাঁর জীবনেরই এক অকপট দলিল।

Reference:

১. বসু, সমরেশ, ‘গঙ্গা’, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৩১
২. বসু, সমরেশ, ‘গঙ্গা’, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ১৩০
৩. বসু, সমরেশ, সমরেশ বসু রচনাবলী – প্রথম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পাদিত), সমরেশ রচনাবলী – ১, ১৯৯৭, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃ. ৬০৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬১, পৃ. ১১

৬. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ (সম্পাদিত), সমরেশ রচনাবলী – ১, ১৯৯৭, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃ. ৫৫৬
৭. রায়চৌধুরী, ড. রুমা (সম্পা.), সমরেশ বসু, 'নিজেকে জানার জন্য', ২০১৩, কলকাতা, অঞ্জলি প্রকাশনী, পৃ. ১৮৮

Bibliography:

- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুতুলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর ১৮৯১-১৯৯০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০৪
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী কুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ (সম্পা.), সমরেশ বসু রচনাবলী ১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০১
প্রাগুক্ত, 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ২, কলকাতা, ২য় সং, ২০০০
প্রাগুক্ত, 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ৩, কলকাতা, ২য় সং, ২০০১
প্রাগুক্ত, 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ৪, কলকাতা, ২য় সং, ২০০৩
প্রাগুক্ত, 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ৯, কলকাতা, ২য় সং, ২০০৪
প্রাগুক্ত, 'সমরেশ বসু রচনাবলী' ১০, কলকাতা, ২য় সং, ২০০৫